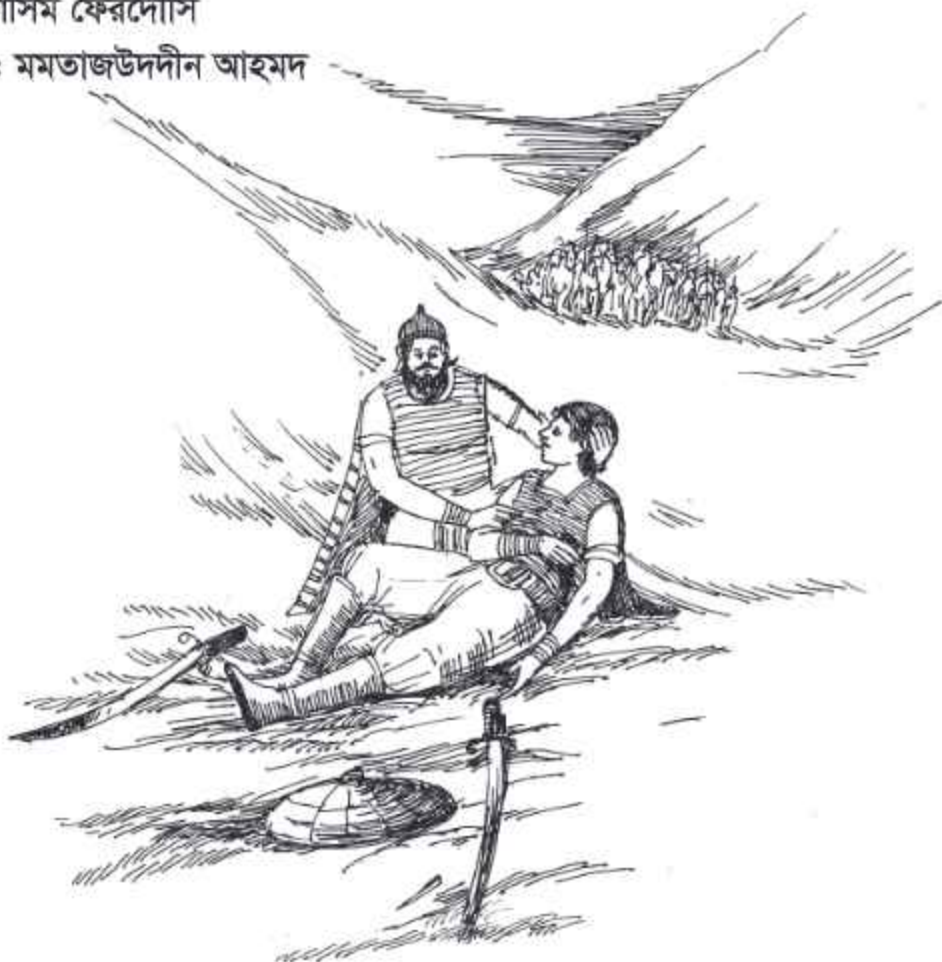


যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র

আবুল কাসিম ফেরদৌসি

রূপান্তর : মমতাজউদদীন আহমদ



যুদ্ধের সাজ পরে নিল সোহরাব। তার বর্শা আকাশের দিকে বলসিত হলো। সে যাবে শত্রু নিধনে, যে তার মাতুল বিন্দারজমকে গোপনে হত্যা করে গেছে। কিন্তু সবার আগে সে সন্ধান করবে জন্মদাতা মহাবীর রক্তমের। পিতাকে গেলে সমস্ত ক্রোধ নির্বাপিত করে তাঁর বক্ষে মাথা রেখে দীর্ঘক্ষণ শান্তি লাভ করবে সোহরাব।

দুর্গের বন্দি সেনাপতি হুজিরকে নিয়ে সোহরাব পাহাড়ের শীর্ষে উঠল। ব্যাকুল সোহরাব বলল, 'ওই যে সবুজ রঙের শিবির, সেখানে এক বিশাল বীর গর্জন করছেন। আর তাঁর শিবিরের সম্মুখে প্রবল দুরন্ত অশ্ব অধীরতা প্রকাশ করছে, তাঁর পতাকায় আজদাহার চিত্র আঁকা আছে, তাঁর বর্শার ডগায় সিংহের মুখ, কে তিনি? বন্দি সেনাপতি, সত্য করে বলুন তো, তিনি কি মহাবীর রক্তম?'

সোহরাবের ব্যাকুল প্রত্যশাকে ক্ষান্ত করে কৌশলী হুজির বললেন, 'আপনার ধারণা সত্য নয়। ওই মহাবীরের প্রকৃত পরিচয় আমি জানি না। তিনি চীনদেশীয় একজন বীর বলে মনে হয়। তবে তিনি যে মহাবীর রক্তম নন, সে বিষয়ে আমার কোনো ভ্রম নেই।'

সোহরাব বলল, 'তবে যে আমাকে আমার জননী বলে দিয়েছেন, ঠিক ওই রকম দেখতে, ঠিক ওই রকম দেহ মহাবীর রক্তমের।'

সোহরাব : ওহে বন্দি, আমি তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমাকে বিশ্বাস করব না আমি। আর বিশ্বাস করলে এ সমরে আমার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন হবে।

হজির : আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি মহত্তম বীর।

সোহরাব : আপনারা কেউ আমার চিণ্ডের সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবেন না।

সোহরাব বেদনায় অস্থির হয়ে ছুটে গেল। তুর্কি সেনাপতি হুমান ও বারমানকে বারবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারাও কি বন্দি হজিরের মতো অনুমান করেন, এ সমরে মহাবীর রুস্তম অংশগ্রহণ করেননি?' আহাঙ্গিয়াবের চতুর সেনাপতিদ্বয় বলল, 'আমরাও শুনেছি মহাবীর রুস্তম ক্ষুব্ধ হয়ে জাবলুস্তান ফিরে গেছেন। তিনি এ যুদ্ধে সশ্রুট কায়কাউসকে রক্ষা করার জন্য উপস্থিত থাকবেন না।'

ব্যাকুল সোহরাবের সমস্ত প্রত্যাশা মিথ্যার পাথরে আছাড় খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগল। বন্দি হজির ভয়ংকর মিথ্যা বললেন কেন? তিনিও কি হুমান ও বারমানের সঙ্গে কূটকৌশলে যুক্ত হয়ে পিতাপুত্রকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চান? নাকি এ তার দেশপ্রেম? যে প্রেমের জন্য তিনি সোহরাবকে সুযোগ দেবেন না রুস্তমকে অতর্কিত আক্রমণ করতে। নাকি সব নিয়তির লীলা! বাস্তবিকই মানুষ বড়ো অসহায় নিয়তির লীলার কাছে। তৃষ্ণার্ত যুবক ছুটে এসেছে না-দেখা পিতার সন্ধানে। যে পিতাকে জগতের সবাই চেনে, যাঁর গৌরবে ইরান বিমুগ্ধ, সেই পিতাকে তার পুত্র এত কাছে এসেও চিনতে পারছে না। কেন এমন হলো, এমন কেন হয় মানবভাগ্য?

ক্ষুব্ধ সোহরাব অতি দ্রুত সজ্জিত করল নিজে। বর্শা, গদা, পাশ ও সুরক্ষিত বর্ম আচ্ছাদিত করল দেহ। দুরন্ত অশ্বকে নিয়ে বায়ুববেগে ছুটে গেল ইরানিদের প্রান্তরে। শত্রুসৈন্যদের সমাবেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোহরাব সরাসরি চলে এল সশ্রুট কায়কাউসের শিবিরের কাছে। আহ্বান করল সশ্রুটকে, মহান অধিপতি, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আমি যুদ্ধে আহ্বান করছি আপনার বীর উত্তমদের। আর কোথায় আপনার মহত্তম বীর রুস্তম? শুনেছি তিনি জাবলুস্তান চলে গেছেন, তাঁকেও আহ্বান করে আনুন। আমি যুদ্ধ চাই।

সোহরাবের আহ্বানে সশ্রুট কায়কাউস ভীত এবং সচকিত হলেন। যুবকের আহ্বানে ইরানের সেনাপতিবৃন্দ সন্ত্রস্ত হলেন। তার সম্মুখে যাওয়ার সাহস কারও নেই।

এ সংকটকালে একমাত্র রক্ষাকারী মহাবীর রুস্তম। তাঁকে শীঘ্র সংবাদ দেওয়ার হোক। তিনি যদি অভিমান করে এ বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত না হন, তখন কী হবে?

সেনাপতি গেও গেলেন রুস্তমের শিবিরে সশ্রুটের অনুরোধ নিয়ে। গেও বললেন, তুরানের এক যুবক বারবার আপনার নাম আহ্বান করছে। সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়।

রুস্তম : আমি কেন সেই সামান্য বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করব?

গেও : ইরানের গৌরবের জন্য, ইরান রক্ষার জন্য।

রুস্তম : সংকটকালেই আমার ডাক পড়ে। আমি এবার কেবল যুদ্ধ দেখব, যুদ্ধে লিপ্ত হব না।

গেও : সশ্রুটের পরামর্শ, আপনি আত্মপরিচয় গোপন রেখে তুরানি বীরের মোকাবিলা করবেন। সে জানবে আপনি রুস্তম নন, রুস্তমের অনুচরমাত্র।

রুস্তম : আমার শিরহাণ, গ্রহরণ, আমার বর্শা আর বর্ম দেখলে সে বুঝে নেবে আমিই রুস্তম।

গেও : তাহলে কি অবাধ্য যুবকের দল মেনে নিয়ে আপনি এ যুদ্ধে নীরব থাকবেন?

রুস্তম : চুপ করো। রুস্তমকে যুদ্ধের বিষয়ে উগদেশ দিয়ে না। যাও, তোমার নির্বোধ সঙ্গীটকে বলো, আমি যুদ্ধে যাব এবং তুরানি বালকের দল মৃত্যিকায় লুপ্তি করে তার আশঙ্কা দূর করব।

গেও : আপনি সত্যিই মহান বীর। আপনি প্রকৃত ইরান-ভরসা।

মনের আনন্দে গেও চলে গেলেন। রুস্তম মনে মনে কৌশল করে নিলেন। তুরানি বালকের কাছে তিনি নিজ পরিচয়ে উদ্ঘাটিত হবেন না।

সামান্য অনুচর হিসেবে সজ্জিত হলেন রুস্তম। হাস্যমুখে শিবির থেকে নিষ্কান্ত হলেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে অবিচল পর্বতের মতো অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন সোহরাব। আজ দিনের আলোতে সোহরাবকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতে রুস্তম অভিভূত হয়ে গেলেন। এ তো কোনো তুরানি বীর নয়, এ তো ইরানের সন্তান। এ বালকের মুখ তো মহাবীর সামের মুখ। এ বালক কে? কে এই যুবককে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেছে? সে যদি তার জন্মদায়িনী মাতা হয়, তাহলে ভুল করেছে। আমি তো এ বালককে এখনই চির অন্ধকার মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ করব।

আর অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন সোহরাব বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অবিচল তাকিয়ে আছে রুস্তমের দিকে। কে ইনি? ইনিই কি সেই মহাবীর, যার বিষয়ে আমার মা আমাকে বহু কথা বলেছেন।

সোহরাব : আপনি!

রুস্তম : তুমি?

সোহরাব : আমি সোহরাব।

রুস্তম : আমি রুস্তম নই।

সোহরাব : কে আপনি?

রুস্তম : আমার পরিচয় জানার জন্য তোমাকে পর্বতের ওই নির্জন পাদদেশে যেতে হবে। নিভৃতে আমার পরিচয় দেব তোমাকে।

সোহরাব : আপনি কখনও সামনগা গিয়েছেন?

রুস্তম : সামনগা যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি।

সোহরাব : তাহলে আমি যা শুনেছি সব অলীক?

রুস্তম : বালক, তোমার সঙ্গে কেবল যুদ্ধের কথা বলব, সামান্য তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করলে আমার প্রভু রুষ্ট হবেন।

সোহরাব : কে আপনার প্রভু?

রুস্তম : আমার প্রভু মহাবীর রুস্তম।

সোহরাব : কোথায় তিনি?

রুস্তম : আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি জীবিত থাকো, তাহলে তোমাকে কেউ না-কেউ বলে দেবে মহাবীর রুস্তম কোথায়? কিন্তু তুমি আদৌ সে সৌভাগ্য নিয়ে ইরানে পদার্পণ করেছ, তা মনে করি না।

রক্তম ও সোহরাব কোনোভাবেই একে অপরকে চিনতে পারল না। যুদ্ধপ্রান্তরে উভয়ের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, সেখানে লেহ ও প্রেমের স্থান নেই। পণ্ড তার সন্তানকে হয়তো চিনতে পারে, শ্রোতের মাছ হয়তো তার শাবকদের লেহদান করে, কিন্তু প্রতিহিংসার অনলে দক্ষীভূত মানবগিতা তার পুত্রকে অথবা মানবপুত্র তার পিতাকে চিনতে পারে না।

পাহাড়ের পাদদেশে সংকীর্ণ প্রান্তরে দুই বীরের যুদ্ধ চলছে। বর্ষার যুদ্ধ, গদার যুদ্ধ। দুজনের দুর্দমনীয় যোগ্যতা। দুজনের অশ্ব ক্লান্ত হলো। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে আসন পড়ে গেল। রক্তম ভাবছেন, এ কোন অজেন্ন বীর যে আমার এত কালের অহংকার চূর্ণ করার জন্য এসেছে? আর সোহরাব ভাবছে, এই যদি রক্তমের অনুচর হয়, তাহলে আমার পিতার শৌর্য কত প্রবল!

রক্তম সোহরাবের কটিদেশের বন্ধন ধরে টান দিলেন। কিন্তু সোহরাবকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। সোহরাব গদা দিয়ে আঘাত করল রক্তমকে। ব্যথা পেলেন রক্তম, তাঁর হাতে রক্ত।

সোহরাব বলল, 'আপনাকে আর আঘাত করব না। আপনাকে আঘাত করলে সংকোচ আর ব্যথা হয় আমার। শিবিরে ফিরে যান আপনি।'

রক্তম ক্রোধাক্ত হলেন। ছুটে গেলেন তুরানিদের মধ্যে। অকাতরে হত্যা করলেন সৈন্যদের। সোহরাবও ছুটে গেল ইরানিদের মধ্যে, সে-ও হত্যা করল বহু ইরানি সৈন্য।

রক্তম ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সোহরাবকে বললেন, 'এ তুমি কী করছ?'

সোহরাব বলল, 'আপনি যা করলেন তার শোধ নিলাম আমি।'

ফুৎ ও বিমর্ষ রক্তম চলে গেলেন শিবিরে। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'আজ অন্ধকার নেমে আসছে কাল প্রভাতে এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসো।'

সোহরাব মৃদু হেসে বলল, 'আপনিও প্রস্তুত থাকবেন।'

সন্ধ্যাট কায়কাউসের কাছে নত মস্তকে এলেন রক্তম। যুবক বীরের শৌর্যের বিবরণ শুনে সন্ধ্যাট বিস্মিত হয়ে বললেন, সে এমন কোন বীর, যে আপনার যোগ্যতাকেও বিপন্ন করেছে। মহাবীর আপনি, মোটেই বিপন্ন হবেন না, নিবিড় ঘুমে রাত্রিযাপন করুন। আপনার বিজয়ের জন্য সমস্ত রাত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব আমি।

রক্তম এলেন নিজের শিবিরে। বীর গেওকে পুনরায় বললেন, তুরানি যুবক বীরের কথা। বালককে দেখামাত্রই তাঁর চিতে যে নিদারুণ লেহধারা উখিত হয়, তা-ও বললেন।

সোহরাব এল শিবিরে। তাঁর মনেও ভীষণ অনিশ্চয়তা। কে এই অজানা মহৎ বীর, যার অস্ত্রচালনা, বর্ষা-নিষ্কেপ, গদার গতি অতি দক্ষ ও সুচারু। অথচ তাঁকে কেউ চিনতে পারে না।

এই নাম-না-জানা বীরকে দেখামাত্রই তার যুদ্ধ বাসনা হারিয়ে যায় কেন? তাঁকে আঘাত করতে তার চিত্ত ব্যাকুল হয় কেন? তার বাহুর রক্ত দেখে চিত্ত বিচলিত হয় কেন?

আগামীকাল প্রভাতে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। সে প্রভাত আর কতকাল পরে আসবে? তাঁকে পুনরায় দেখার জন্য যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সেনাপতি হুমান, আপনি বলুন এ মহাবীর কে? আমার মা যে বর্ণনা দান করেছেন, তার সঙ্গে এ বীরের অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে। অথচ আপনারা বলছেন, মহাবীর রুস্তম এ সময়ে উপস্থিত নেই। হুমান বললেন, 'হাঁ তা-ই। আপনি এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। যে মহাবীরের সঙ্গে লিগু আছেন, তাকে কাল প্রভাতে নিধন করে নিশ্চিত মনে পিতার কথা চিন্তা করবেন। এখন নিঃশব্দ নিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করুন। বিশ্রাম আপনাকে সাহায্য করবে।'

সোহরাব হুমানের কথা শুনে শয্যাগ্রহণ করতে গেল। রাত্রির অবসান হলো। পাহাড়ের অন্তরাল থেকে সূর্যের রক্তিম আভা বিস্তার লাভ করল। পাখিরা কুজন করল।

মহাবীর রুস্তম এলেন প্রান্তরে। শূন্য প্রান্তরে সোহরাব তখনও উপস্থিত হননি। রুস্তমের চিত্ত অকস্মাৎ শূন্য হয়ে উঠল।

সোহরাব এল। তাকে দেখে আনন্দ পেলেন রুস্তম। সম্ভাষণ বিনিময় হলো দুজনের। তরুণ সোহরাব প্রবীণ রুস্তমকে বিনীতভাবে বলল, 'আপনাকে যা বলব, তা একান্ত আমার কথা। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ চাই না। যে চায়, সে যুদ্ধে লিগু হোক, আমি আর আপনি যুদ্ধ করব না। আমরা বসে বসে অনেক কথা বলব। জীবনের কথা, আনন্দের কথা, শক্তির কথা। প্রয়োজনে আমরা পরিচয় বিনিময় করব। আপনি জেনে নেবেন আমি কে, আমি জেনে নেব আপনি কে? গতকাল আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হয়েছে। আপনার দক্ষতা ও বীরত্বের সন্ধান পেয়ে আমার মনে বারবার দ্বন্দ্ব হয়েছে, আপনি স্বয়ং মহাবীর রুস্তম। আজ আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমাকে বলুন কে আপনি, কোথা থেকে এসেছেন এ যুদ্ধে?'

রুস্তম সোহরাবের প্রশ্নে বিচলিত হলেন। বারবার মিথ্যা বলতে দ্বিধা হলো তাঁর। তিনি বলতে উদ্যত হলেন আমিই রুস্তম। কিন্তু প্রবীণ যোদ্ধা সংশয়ের কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে বললেন, 'আমি দাঁড়লাম, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি আমি, যুদ্ধই আমার কাম্য। আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিগু হও। না-হয় তীত শাবকের মতো পলায়ন করে লজ্জিত জননীর কোলে আত্মগোপন কর।'

রুস্তমের বিদ্রূপবাক্যে সোহরাব উত্তেজিত হলো। ত্বরিত প্রস্তুত করণ নিজেকে। ছুটে এল রুস্তমের মুখোমুখি। শুরু হলো দুই মহান বীরের মধ্যে মল্লযুদ্ধ। দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী দূরে দাঁড়িয়ে অভূতপূর্ব যুদ্ধ লক্ষ্য করছে। ধুলায় ধলাকার হয়ে গেল প্রান্তর। দুই বীরের গর্জনে আকাশ মুখরিত। ঘর্মাড় ও ক্লান্ত হলেন প্রবীণ রুস্তম। সোহরাব এক প্রবল চাপ সৃষ্টি করে মহাবীর রুস্তমকে ভূপাতিত করল এবং বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিয়ে তাঁর বুকে চেপে বসল। সোহরাব কোমর থেকে টেনে নিল তীক্ষ্ণধার ছুরি। এখন প্রবীণ ও দান্তিক বীরের শির বিচ্ছিন্ন করবে সে।

সোহরাবের অমিত শক্তির নিচে পড়ে আছেন মহাবীর রুস্তম। সোহরাবের তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাতে রুস্তমের প্রাণবায়ু চলে যাবে। সোহরাব তার দুষমনকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে দেরি করছে কেন? সামান্য দেরি তো তার জন্য আত্মঘাতী হতে পারে। তবু সোহরাব আরও একবার শত্রুর মুখ ভালো করে দেখে নিল।

আর মহাবীর রুস্তম তাঁর অপরিমেয় অভিজ্ঞতার গুণে রক্ষা লাভের একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। কিশোর বীর সোহরাবকে বললেন, 'ওহে তুরানি বীর, আমাকে যে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তুমি কি যোদ্ধার প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জান না?'

সোহরাব : কী ধর্ম? শত্রুকে হত্যা করতে ধর্মের কী প্রয়োজন?

রুস্তম : তোমার মতো ধর্মহীন তুরানি বীর তো জানে না, ইরানি বীরের একটি ধর্ম আছে। তা হলো, সমকক্ষ বীরকে প্রথম পরাজয়ের কালে হত্যা করা অন্যায়। তাকে আর একটি সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেই তুমি নির্দিষ্টায় আমাকে হত্যা করতে পার।

সোহরাব : আমি এমন ধর্মের কথা আগে শুনিনি। কিন্তু তুমি প্রবীণ যোদ্ধা, তোমার কথা অবশ্যই ঠিক।

রুস্তম : হ্যাঁ ঠিক।

সোহরাব : ইরানের মহাবীর রুস্তম কি তোমার এই ধর্ম মেনে চলেন?

রুস্তম : নিশ্চয়।

সোহরাব : তাহলে তোমাকে নিঃসংকোচে মুক্তি দিলাম। এখন বিশ্বাসের জন্য চলে যাও। দ্বিতীয়বার পরাজিত হওয়ার জন্য এখানেই চলে এসো। তখন তোমার মৃত্যু ঘটবে।

সোহরাব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। ক্লান্ত রুস্তম জীবন ভিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে নদীতীরে অহসর হলেন। আজ তিনি যেমন অবসন্ন, তেমনি মন তাঁর মিথ্যাচারে জর্জরিত। এত বড়ো নিদারুণ লজ্জা তিনি দীর্ঘ জীবনে কোনোদিন পাননি।

তুরানি সেনাপতি হুমান শুনলেন, সোহরাব ভূপাতিত রুস্তমকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। তিনি অনুশোচনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'এ আপনি কী করেছেন সোহরাব? জানান কি, আপনি কাকে মুক্ত করেছেন?'

সোহরাব সচকিত হয়ে বলল, 'কে তিনি?'

হুমান মুহূর্তের মধ্যে সাবধান হয়ে বললেন, 'তিনি নিশ্চয় ইরানের একজন প্রধান বীর।'

সোহরাব হেসে উঠে বলল, 'একজন কেন, দশজন বীরকে আমি ছেড়ে দেব। আমি ইরানে এসেছি মহাবীর রুস্তমের সঙ্গে মিলিত হতে, আমি এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি।'

নদীর শ্রোতের মধ্যে নেমে রুস্তম বারবার শীতল পানি দিয়ে নিজের মুখ ধুয়ে নিলেন। ধুলায় ধূসরিত শরীর মার্জনা করলেন। বড়ো পিপাসার্ত তিনি। অঞ্জলি ভরে পানি তুলে বারবার পান করলেন। লজ্জায় দুঃখে তাঁর মন এখন অবসন্ন হয়ে আছে। জীবনের অপরাধে বেলায় সৃষ্টিকর্তা তাঁকে নিয়ে এ কী নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন। সামান্য এক বালকের হাতে তিনি আজ পরাজিত হয়েছেন। অপরিচিত অপরিজ্ঞাত সে বালকের কী পরিচয়?

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে রুস্তম দুই হাত তুললেন। কাতর কণ্ঠে প্রভুর করুণা প্রার্থনা করলেন, 'হে প্রভু, আমাকে শক্তি দাও, গৌরব সংরক্ষণের শৌর্য দাও আমাকে। এতকাল তুমি আমাকে গৌরবে শীর্ষস্থানীয় করেছ, আজ কোন অপরাধে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করছ? আমার করুণ আবেদন শ্রবণ কর মহান প্রভু।'

মহাবীর রক্তমের মনে হলো, মহান ঐশ্বর্যে আত্মানে সাড়া দিয়েছেন। অমিত শক্তির উত্থান ঘটেছে তাঁর শরীরে। পুনরায় হয়েছেন তিনি অজেয়। কৃতজ্ঞতায় রক্তমের মন ভরে উঠল। তিনি নদীর স্রোত থেকে উঠে এলেন। এগিয়ে গেলেন যুদ্ধের নিরালা প্রান্তরে। এবার তিনি শৌর্যে ছিঁর।

দিন গেল। রাত্রি এল। এল নব প্রভাত। ওই তো যুবক ধীরে ধীরে আসছে। যুবকের মুখে মনজুড়ানো সেই স্নিগ্ধ হাসি। যুবকের মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় কিরণ। রক্তমের চিত্ত আবার ব্যাকুল হলো। তবে তা মাত্র ক্ষণিকের জন্য। শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। প্রখর উজ্জ্বল সূর্য ঈশ্বরের প্রতিভা হয়ে দেখছে পিতা-পুত্রের যুদ্ধ। পুত্র যুদ্ধ করছে পিতার প্রতি সহানুভূতি ধারণ করে। আর পিতা যুদ্ধ করছেন স্বীয় গৌরব সংরক্ষণের জন্য। আজ সোহরাব বড়ো অস্থির, বড়ো চঞ্চল তার মন। ভিন্ন চিন্তায় অন্যমনস্ক সোহরাব অকস্মাৎ পড়ে গেল মাটিতে। মহাবীর রক্তম তৎক্ষণাৎ তার বুকে বসে পড়লেন দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে।

সোহরাব তবু হাসছে। রক্তম টেনে নিলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। সোহরাব তবু হাসছে। রক্তম উদ্যত করলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। সোহরাব বলল, 'ওহে বীর, এ আমার প্রথম বারের পরাজয়। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের জন্য আমাকে মুক্ত কর। বীরের ধর্ম পালন করা।'

রক্তম বললেন, 'শত্রুকে করতলগত করে কোন বীর কোথায় তাকে মুক্ত করেছে হে নির্বোধ বালক?'

রক্তম বিলম্ব না করে তীব্রভাবে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ঢুকিয়ে দিলেন সোহরাবের বক্ষে। সোহরাবের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। আত্ননাদ করল সোহরাব।

আক্রমণকারীকে ব্যথিত কর্তে চিৎকার করে সোহরাব বলল, 'ওরে কাপুরুষ, ইরানি বীর, তুই যা করলি, তার জন্য তোকে সমুচিত শাস্তি পেতে হবে। নির্মম শাস্তি হবে তোরে। যদি তুই মাছ হয়ে সাগরের নিচে পালিয়ে থাকিস, যদি বায়ু হয়ে আকাশে মিশে যাস, যদি অগ্নি হয়ে সূর্যের মধ্যে গোপন হোস, আর যদি অন্ধকার হয়ে রাত্রির মধ্যে আশ্রয় লাভ করিস, তবু তোরে নিস্তার নেই।'

রক্তম : কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সোহরাব : নিশ্চয়ই পারবে। যখন ইরানের মহাবীর রক্তম শুনতে পাবেন তাঁর পুত্র সোহরাবকে তুই অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছিস, তখন তোরে নিস্তার থাকবে না।

রক্তম : সোহরাব! রক্তমের পুত্র তুই? মিথ্যা কথা। না, আমার কোনো পুত্র নেই। আমার পুত্র যুদ্ধ করতে আসেনি।

সোহরাব : তুমি রক্তম! বলো, তুমিই রক্তম। বলো—

রক্তম : হ্যাঁ, আমিই রক্তম।

সোহরাব : পিতা, আমার জন্মদাতা তুমি। আমাকে ছলনা করো না পিতা, আমার শেষ বিদায় কালে আমাকে সত্য বলো, তুমি সেই রক্তম, আমার স্নেহময়ী মাতা তহমিনার স্বামী তুমি, তুমিই আমার পিতা। বলো, আবার বলো।

রক্তম : হ্যাঁ, আমিই, আমিই। কিন্তু আমি তো জানি—

সোহরাব : কী জান তুমি? আমার বর্ম উন্মোচন করো। আমার দক্ষিণ বাহুতে তোমার স্বর্ণকবচ দেখ। মহাবীর সামের হাতের কবচ তুমি দিয়েছিলে আমার জননীকে। আমাকে পুত্র বলে আহ্বান কর, আমাকে বন্ধে ধারণ করো পিতা।

রুস্তম : হাঁ, এই তো, এই সেই স্বর্ণকবচ! আমিই দিয়েছিলাম তহমিনাকে। ওরে পুত্র, ওরে সোহরাব, এ কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল! করুণাময় মহাপ্রভু, আমি তো নিজপুত্রকে নিজহাতে হত্যা করার জন্য তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিনি।

রক্তের ধারায় সিক্ত সোহরাব পিতার বন্ধে আশ্রয় নিয়েছে। রক্তের শ্রোতে ভেসে যাচ্ছে ধরণী। মধ্যাহ্নের সূর্য ক্রমে স্তান হয়ে আসছে। পিতা রুস্তম তীব্র যন্ত্রণায় নিজের শরীরকে নখের আঁচড় দিয়ে ছিন্ন করছেন।

মহাবীর রুস্তম এবং সামান্য-কন্যা তহমিনার একমাত্র সন্তান সিংহশাবক সোহরাব ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় ঘুম, অনন্ত ঘুম। কার সাধ্য তাকে আর জাগায়?

লেখক-পরিচিতি

আবুল কাসিম ফেরদৌসির জন্ম ৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে (কারও কারও মতে ৯৪১ খ্রি.) ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুস নগরে। নিরলস ৩০ বছর পরিশ্রম করে ফেরদৌসি 'শাহনামা' কাব্যটি রচনা করেন। এটি ইরানের জাতীয় মহাকাব্য। এ কাব্যের প্রতিটি চরণ রচনার জন্য এক দিনার করে কবি ষাট হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে ষাট হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দেন। সন্ত্রম-সচেতন কবি ফোভে-দুঃখে সুলতান মাহমুদের গজনি ছেড়ে বাগদাদে চলে আসেন। সুলতান মাহমুদের দূত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও তিনি আর ফিরে যাননি গজনিতে। শেষজীবনে কবি তাঁর মাতৃভূমি তুস নগরে ফিরে আসেন। গভীর মনোবেদনা নিয়ে পরিণত বয়সে ১০২০ খ্রিষ্টাব্দে মহাকবি ফেরদৌসি মৃত্যুবরণ করেন।

রূপান্তরকারী লেখক-পরিচিতি

মমতাজউদদীন আহমদের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায়। তিনি প্রধানত নাট্যকার ও অভিনেতা। কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে তাঁর সরকারি কলেজে শিক্ষকতায়। তাঁর ? বিপুল রচনাবলির মধ্যে রয়েছে নাট্যবিষয়ক গবেষণা, মৌলিক ও রূপান্তরিত নাটক এবং বিচিত্র বিষয়ে গদ্যরচনা। তাঁর বিখ্যাত মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'কি চাহ শঙ্খচিল', 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' প্রভৃতি। সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি, একুশে গদক ও শিশু একাডেমি পুরস্কার। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মমতাজউদদীন আহমদ মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

ফেরদৌসির মহাকাব্য ‘শাহনামা’ থেকে মূলভাব গ্রহণ করে গল্পটি লেখা হয়েছে। ইরানের পাশের শক্তিশ্রিয় দেশ সামনগার রাজকন্যা তহমিনাকে বিয়ে করেন মহাবীর রুস্তম। বিয়ের অল্পকালের মধ্যে রুস্তম তাঁর রাজ্য ইরানে ফিরে যান। তহমিনার গর্ভে জন্ম নেয় রুস্তমের সন্তান বীর সোহরাব। ছেলে জন্মানোর সংবাদ পেলে রুস্তম সন্তানকে তাঁর মতোই যুদ্ধে নিয়ে যাবে— এ ভয়ে মা তহমিনা স্বামী রুস্তমকে খবর পাঠান একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। এ থেকেই মূল বেদনা-গাথার শুরু। ‘যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র’ মহাবীর রুস্তম কীভাবে পুত্র সোহরাবকে হত্যা করল সেই বেদনামাখা কাহিনি। এখানে দেখা যায়, ছেলে সোহরাব পিতার খোঁজে এসেছে ইরান, কিন্তু কেউই রুস্তমের সন্তান দিতে পারছে না। অথচ নিজেরই অজান্তে তরবারি ধরতে হলো পিতার বিরুদ্ধে এবং মৃত্যুও হলো তার। মৃত্যুর সময় দুজন জানতে পারল যে, সম্পর্কে তাঁরা আসলে পিতা ও পুত্র। মহাবীর রুস্তম অচেনা তুরানি বালকের কাছে পরাজিত না হওয়ার জন্য বীরত্বকে বিসর্জন দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। নিজের হাতে ছুরিবিদ্ধ করে আপন সন্তানের বুক। পরিচয় পাওয়ার পর জীবনে নেমে আসে হাহাকার।

জয় বা বীরত্ব কাক্ষিত ও প্রশংসনীয়। কিন্তু বীরত্বের নামে প্রতারণা জীবনে বয়ে আনতে পারে চরম মানবীয় বিপর্যয়— যা এ গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

নিধন	— হত্যা।
মাতুল	— মামা।
নির্বাপিত	— নিবে গিয়েছে এমন।
দুর্গ	— সৈন্য থাকার স্থান।
চূর্ণ-বিচূর্ণ	— গুঁড়া গুঁড়া হওয়া।
কূটকৌশল	— চতুর কৌশল।
নিয়তির লীলা	— ভাগ্যের খেলা।
বিমুগ্ধ	— বিশেষভাবে মুগ্ধ।
দুরন্ত	— অশান্ত, ভীষণ।
বীর্যোত্তম	— বীরদের মধ্যে উত্তম।
মহত্তম	— সবচেয়ে মহৎ।
সংকটকাল	— বিপদের সময়।
শিরদ্বাগ	— যুদ্ধে মাথায় পরার বর্ম বিশেষ।
দস্ত	— অহংকার।
নিষ্কান্ত	— চলে যাওয়া।
অলীক	— মিথ্যা, অপার্থিব।
পদার্পণ	— পা রাখা, আসা।

অনুশাসন	— আইন, প্রথা।
দুর্দমনীয়	— যা সহজে দমন করা যায় না।
শৌর্য	— বীরত্ব, সাহস।
হ্রোদধাক	— হ্রোদে অন্ধ।
শিবির	— তাঁবু। সেনা-নিবাস।
বিপন্ন	— বিপদগ্রস্ত।
মল্লযুদ্ধ	— কুস্তি, অস্ত্র ছাড়া যে যুদ্ধ।
তীক্ষ্ণধার	— খুব ধারাল।
অমিত	— অপরিমিত, প্রচুর।
অপরিমেয়	— অসংখ্য, পরিমাণ করা যায় না এমন।
জর্জরিত	— নিপীড়িত, জীর্ণ।
অনুশোচনা	— পরিতাপ, খেদ।
করতলগত	— নাগালের মধ্যে। মুঠোর ভেতরে।
স্বর্ণকবচ	— সোনা দিয়ে বানানো মাদুলি বা তাবিজ।